১৯৭১ ভেতরে বাইরে অধ্যায়ঃ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

একটি নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ বিশ্লেষন (পর্ব ৪)

২৫শে মার্চ ঢাকাঃ রাত্রে স্বচক্ষে ঢাকা শহরে বর্ব্বর পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাজজ্ঞ দেখার একদিন পর জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব ২৭শে মার্চ নিজে জীপ চালিয়ে আজিমপুর যান (পৃঃ ৫১)। তার নিজের ভাষায় “চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ”। সন্ধ্যায় নাখালপাড়ায় এয়ার ফোর্স মেস থেকে তিনি আবারও গনহত্যা দেখেন আর দ্বিতীয় বারের মত সিদ্ধান্ত নেন, “এদের সাথে আমি এক মূর্হুতও থাকবো না”।

২৬ শে মার্চ ১৯৭১, তুলন, ফ্রান্স। তুলন ঘাটির মানগ্রো সাবমেরিনে ১৩ জন বাঙ্গালী সাবমেরিনার স্বদেশ থেকে অনেক দূরে ইউরোপের নিরাপদ মাটিতে সর্ম্পূন নিরাপদ পরিবেশে বেশ সুখেই ছিলেন। ২৬ শে মার্চ সুদুর ফ্রান্সে বিবিসির সংবাদ বুলেটিনে বাংলাদেশের সর্ব্বশেষ এবং চরম পরিস্থীতির ঘটনা শোনার পর তারা সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহ করার। ফ্রান্স থেকে, সুইজারল্যান্ড, স্পেন হয়ে তারা ৮ এপ্রিল বোম্বে এয়ারপোর্টে এসে পৌছান। (১)।

২৭ মার্চ ব্রাম্মনবাড়িয়া’য় অবস্থিত ৪ বেঙ্গল বিদ্রোহ করে তাদের সিও’কে বন্দী করে।

২ এপ্রিল এম, এন এ কর্নেল ওসমানী (অব) ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার মতিনগর সীমান্ত পার হন।

৩ বা ৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ব্রাম্মবাড়িয়ার এলেন। (২)

৪ এপ্রিল হবিগঞ্জএর তেলিয়াপাড়া চা বাগানে বাঙ্গালী বিদ্রোহী অফিসারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ত্ব করেন ততকালীন এম, এন এ কর্নেল ওসমানী (অব)।

১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন করা হয়।

১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার শপথ গ্রহন করেন।

“১৮ এপ্রিল বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ আর বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল শহীদ হন।

২৫ এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশের ভুখন্ডে আমাদের আর কোন অবস্থান রইলো না”। (২)

জনাব এ, কে খন্দকার তার সমগ্র বইয়ে মেজর কাইয়ুম খান (অব) এর ‘বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল’ বইয়ের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ১৯৭১ সালের ছাত্র কাইয়ুম (মেজর কাইয়ুম খান (অব)) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম এর নির্দেশে মতিনগরে ক্যাম্প থেকে ঢাকায় এসে মেজর শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম এর স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে মতিনগর ক্যাম্পে ফিরেও আসেন। (‘বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল’ মেজর কাইয়ুম খান (অব) পৃঃ ৬৯)

এই সর্ম্পূন সময়ের মধ্যেও জনাব এ, কে খন্দকার ঢাকা থেকে একশ মাইলের কম দুরুত্বের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারলেন না। ততদিনে প্রথম বার দেশ ত্যাগের চেষ্টার সহযাত্রী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুব’কে পাকিস্তানে বদলি করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৫ মে জনাব এ, কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে আগরতলার কাছাকাছি মতিনগর ক্যাম্পে পৌছান! ভানু’র কৌতুকের মত, এই সর্ম্পূন সময় ধরে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব শুধু ভাবতেই থাকেন, “কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করা যায়”! (পৃঃ ৭১)

জনাব এ কে খন্দকারের ‘বস’ পাকিস্তান বিমান বাহিনী’র ঢাকা বেইস কমান্ডার এয়ার কমোডর মাসুদ’ পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাজজ্ঞ দেখার পর তিনি বেসামরিক জনগনের উপর সরাসরি বিমান হামলা চালানোর বিরোধিতা করেন। যার ফলশ্রুতিতে ৩১ র্মাচ পশ্চিম পাকিস্তানী এয়ার কমোডর মাসুদ’কে অব্যহতি দেওয়া হয়।

লক্ষনীয় বিষয়, ১৯৭১ সালের ১৫ মে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পূ্র্ব মূর্হুত পর্যন্ত জনাব বাঙ্গালী এ কে খন্দকার মধ্য মে পর্যন্ত বহাল তবিয়তে ঢাকা বেইস এ র্কমরত ছিলেন র্মাচ এবং এপ্রিল মাসের ‘বেতন- ভাতা’ও গ্রহন করেছিলেন! ২৮ র্মাচ ছুটি চাওয়া মাত্রই পেয়েছিলেন। ছুটির পর র্কমস্থলে ফিরে আসলেও, কেউ তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করেনি তিনি পূ্র্ববর্তী দুই সপ্তাহ কোথায় ছিলেন!

তিনি তো শহীদ মতিউর রহমান বীর শ্রেষ্ঠ’র মতো কিছু করার চেষ্টা বা করতে বা করাতে পারতেন! অথবা বায়াফ্রা’র সেই সুইডিস নাগরিক র্কাল গুস্তাফ’এর মতো। ১৯৬৯ সালে ২২ মে র্কাল গুস্তাফ নামের এক সুইডিস মানবতাবাদী বৈমানিক বায়াফ্রায় নাইজেরীয় সরকারের অত্যাচার এবং হত্যাজজ্ঞ বন্ধের লক্ষে র্কাল গুস্তাফ ও তার চার সহযোগী মিলে বেসামরিক বিমানে রকেট লাগিয়ে অতর্কিতে নাইজেরীয় কয়েকটি বিমান ঘাটিতে হামলা চালিয়ে নাইজেরীয় বিমান বাহিনী’র অনেকগুলি বিমান মাটিতেই ধ্বংস করে দেন!

পাকিস্তান বিমান বাহিনী'র ঢাকা বেইস'এর উপপ্রধান, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরিক্ষীত সাহসী বৈমানিক জনাব এ কে খন্দকার সাহেরের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী ঢাকা বেইস'এর সব কিছু ছিল তার নখর্দপনে। ঢাকা বেইস' তার সঙ্গে ছিলেন আরো অনেক সাহসী বাঙ্গালী বৈমানিক যেমন উইং কমান্ডার বাশার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সদরুদ্দীন (এই চার জনই পরর্বতীতে বিমান বাহিনী প্রধান হয়েছিলেন) আর বিমান সেনা। কিন্তু তিনি সাহসী কোন পদক্ষেপ নেওয়া তো দুরের কথা, এই ধরনের চিন্তাও করেছেন বলে কোথাও কোন প্রমান পাওয়া যায় নাই।

বইটি রচনা করার সময় জনাব এ, কে খন্দকার'এর মত দ্বায়িত্ববান ব্যাক্তি(?) যে প্রয়োজনীয় গবেষনা বা ফ্যাক্ট চেক করেন নাই সেই বিষয়টি খুবই দৃষ্টি কটু হয়ে ধরা পরবে সচেতন পাঠকের কাছে। বইটি প্রকাশিত হবার পরও তিনি বইটি পড়ে দেখেছেন কিন তা ও প্রশ্নবিদ্ধ।

যেমন তিনি লিখেছেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুব (প্রথম বার দেশ ত্যাগের চেষ্টার সহযাত্রী) ১৯৭২ সালে এক বিমান র্দূঘটনায় নিহত হন। ১৯৭২ সালে জনাব এ, কে খন্দকার' ছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুব যদি ১৯৭২ সালে নিহত হতেন তা হলে ততকালীন বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে জনাব এ, কে খন্দকার' সাহেবের অবশ্যই মনে থাকার কথা।

মারগুব ভাই ছিলেন আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বুয়েটের সহপাঠি খোকন (উত্তরার মাস্কাট প্লাজা'র জিয়াউল হক খোকন) এর দুলাভাই। ১৯৮২ সালে আমরা যখন বুয়েটের ছাত্র, সেই সময় মারগুব ভাই এক র্মমান্তিক বিমান র্দূঘটনায় নিহত হন।

সরাসরি জড়িত এই ধরনের ব্যাক্তিগত র্স্পশকাতর ঘটনার ব্যাপারেও জনাব এ, কে খন্দকার' সাহেবের যখন স্মৃতিভ্রম হয়, তখন বিচ্ছিন্ন না অথবা ব্যাক্তিগতভাবে অনুপস্থিত বিভিন্ন বিষয়ে তার বক্তব্য কতটা গ্রহনযোগ্য হবে বা গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত তা ভেবে দেখার দরকার আছে।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ২১ ডিসেম্বর , victory1971@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

১। চাঁদপুরে নৌ-মুক্তিযুদ্ধ, মো শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক

২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল

৩। ‘বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল’ মেজর কাইয়ুম খান (অব)

৪। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের

৫। বিদ্রোহী র্মাচ ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম (অব) পি এস সি

Count **Carl Gustaf Ericsson von Rosen** (August 19, 1909 – July 13, 1977) was a Swedish pioneer aviator, humanitarian। Von Rosen's involvement in Africa did not end with the Congo Crisis. He gained international fame seven years later when he flew relief missions for aid organisations into war torn Biafra, a breakaway republic of Nigeria.[3] These flights included flying a DC-7 from São Tomé to Uli at only a little above sea level in August 1968.[5]

Disgusted at the suffering the Nigerian government inflicted on the Biafrans and the continuous harassment of international relief flights by the Nigerian Air Force, he hatched a plan in collaboration with the French secret service to strike back at Nigerian air power. He imported five small civilian single engine Malmö MFI-9 planes produced by SAAB, which he knew could also be used for a ground attack role in warfare. He had the planes painted in camouflage colours and fitted with rockets from Matra, and proceeded with a crew of two Swedes and two Biafrans to form a squadron called 'Biafra Babies' to strike the air fields from which the federal Nigerian Air Force launched their attacks against the civilian population in Biafra. On May 22, 1969, and over the next few days, von Rosen and his five aircraft launched attacks against Nigerian air fields at Port Harcourt, Enugu, Benin and other small airports. The Nigerians were taken by surprise and a number of expensive jets, including a few MiG-17 fighters and three out of Nigeria's six Ilyushin Il-28 bombers, were destroyed on the ground.